গদ্য লিখি :
নির্ভুল, নিশ্চিন্তে

এস. এম. হারুন-উর-রশীদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

ভূমিকা

বানানের বই নয় পুরোপুরি। বানানকে উপলক্ষ্য করে অন্য সব বিষয় এসে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভাষার ভেতরের জগতের সুলভ পরিচয় পেতে পারে, সেজন্য এই উদ্যোগ, আয়োজন ও প্রচেষ্টা। কতটা সফল হবে, জানি না।

বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর কথায় আঞ্চলিক টান রয়েছে। এ টান দোষের নয়। তবে আঞ্চলিক উচ্চারণের পাশে প্রমিত উচ্চারণ সবার কাম্য। কেননা, তোমাকে দেশের বৃহত্তর পরিধিতে যেতে হবে শিক্ষা-কর্ম ও প্রয়োজনের তাগিদে। সবার বোঝার জন্য প্রমিত উচ্চারণ শেখা তাই জরুরি, সেইসাথে বাংলাভাষার নানা-রকম শৃঙ্খলার উপাদান। প্রমিত ভাষা শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন, তাই যে-কোনোভাবেই তোমাকে মাতৃভাষার এই নিয়ম-কানুন রপ্ত করতে হবে। লিখতে হবে নির্ভুল, স্বচ্ছন্দ গতিতে। শব্দের সাথে বাক্য নির্মাণের কিছু নিয়ম এখানে বাত্‌লে দেওয়া হল, সেইসাথে টুকরো কিছু পরামর্শ, টিপস্। গদ্যের ভেতর আবেগ-উত্তাপ ও যুগপৎ শৃঙ্খলা না থাকলে ভালো গদ্যকার হওয়া যায় না।

অনিয়ন্ত্রিত ভাব ও বিষয়কে একটি ভাষা-শৃঙ্খলার ছকে আটকাতে হবে। এ কাজ পরিশ্রমের, তবে দুঃসাধ্য নয়। এ অঙ্গনে নিবিড় নিষ্ঠা ও সতর্ক পদক্ষেপ তোমাকে সাফল্য এনে দেবে, ইনশাআল্লাহ।

রাহনুমা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মাহমুদুল ইসলামের বারবার তাগিদ ও অনুপ্রেরণায় কাজটি দ্রুত এগিয়ে গেছে। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বইটি তাবৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত। তারা উপকৃত হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। সবার এ পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ কামনা করি।

এস. এম. হারুন-উর-রশীদ
মুকুন্দপুর, কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা
জানুয়ারি, ২০২২
ই-মেইল : smhrashid58@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ফিরে তাকাই : বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা—১৩

এক. [ভাষা]—১৩

দুই. [বর্ণ]—১৪

তিন. [বাঙলা লিপি]—১৬

চার. [আবিষ্কার ও বিকাশ]—১৭

পাঁচ. স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা—১৮

ছয়. কার ও ফলা—১৯

সাত. কয়েকটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ—২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ই-কার/ঈ-কার ও উ-কার/ঊ-কার—২৬

ই-কার/ঈ-কার—২৬

উ-কার/ঊ-কার—২৯

ও আর ও-কার কোনটা কোথায় বসবে?—৩০

‘ক’ দিয়ে যত প্রশ্নবাচক শব্দ—৩৭

ঙ আর ং : কোনটি কোথায় বসবে?—৩৯

কোথায় ঙ বসবে?—৩৯

কোথায় ং বসবে?—৩৯

উভয় বর্ণই (ঙ অথবা ং) যেখানে বসবে—৪০

হসন্ত হরকত নয়, জযমও নয়—৪১

চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার কি জরুরি?—৪৩

ণ আর ন-এর বিবাদ মিটিয়ে ফেলি—৪৬

শব্দ শেষে ণ হচ্ছে এমন শব্দ—৪৮

শব্দ শেষে ন হচ্ছে এমন শব্দ—৪৮
‘ষ’ ব্যবহারের কিছু নিয়ম—৫২

‘না’ নিয়ে নানান কথা—৫৪
‘না’ ‘নয়’-এর আরও কয়েকটি ব্যবহার—৫৬
উপসর্গ দিয়ে ‘না’—৫৬
‘না’ কীভাবে লিখবে
‘না’ ফাঁক হবে—৫৮
‘নি’ জুড়ে বসবে—৫৮
‘নে’ জুড়ে বসবে—৫৮

অণুশব্দ : লগ্নক ও পদাণু—৫৯
লগ্নক—৫৯
ক. ক্রিয়া বিভক্তির লগ্নক (উচ্চারণে)—৫৯
খ. কারক-বিভক্তিতে লগ্নক—৫৯
গ. নির্দেশক লগ্নক—৬০
ঘ. বচন লগ্নক—৬০
একের বেশি লগ্নক—৬০
পদাণু—৬০

সমাসবদ্ধ শব্দ : ফাঁক না আলাদা?—৬২
ক. লেগে বসবে—৬৩
খ. পৃথক হবে—৬৪
এক—শব্দ—৬৪

শব্দসংক্ষেপে ‘বিন্দু’ লিখি—৬৫
উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম —৬৮
অ-শব্দের আদিতে—৬৯
অ-শব্দের মধ্যে—৭১

অ-শব্দের অন্ত্যে—৭১
ই, ঈ, উ, ঊ-এর উচ্চারণ—৭৩
ঋ-এর উচ্চারণ—৭৩
এ-এর উচ্চারণ—৭৩
কৃতঋণ শব্দের উচ্চারণ—৭৫
শ, ষ এবং স-এর উচ্চারণ—৭৬
তোমাদের অনুশীলনের জন্য কতিপয় শব্দের উচ্চারণ দেখানো হল—৭৬

কিছু শব্দ ব্যবহারের নিয়ম—৮১
এক. অনূদিত/অনুবাদিত—৮১
দুই. অধ্যাপক/অধ্যাপিকা—৮১
তিন. অন্ধ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী—৮২
চার. আদিবাসী/উপজাতি—৮২
পাঁচ. উপ-উপচার্য/প্রো-উপাচার্য/সহ-উপাচার্য—৮২

ব্যাকরণিক শব্দ
ছয়. ও/এবং/আর —৮৩
এবং-এর চলন আলাদা—৮৪
সাত. উল্লেখিত/উল্লিখিত—৮৪
আট. এমনই/এমনি—৮৪
নয়. একরকম/এক রকম—৮৫
দশ. কেন না/কেননা—৮৫
এগারো. কি না/কিনা—৮৫
‘কিনা’-র উল্টো ‘নাকি’—৮৬
বারো. তাই/তা-ই—৮৭
তেরো. নাহলে/না হলে—৮৭
চৌদ্দ. কীভাবে লিখবে অঙ্কের সংখ্যা?—৮৭
পনেরো. কীভাবে লিখবে গুরুত্বপূর্ণ দিন ও সাল?—৮৮

ষোলো. বিদেশি শব্দে অ্যা (এ/এ্য/এ্যা নয়)—৮৯
সতেরো. স/স্ব—৮৯
আঠারো. গুলি/গুলো/গুলা—৯০
উনিশ. এ, যে, সে—কীভাবে লিখবে?—৯০
বিশ. দু. দু—৯০
একুশ. স্ত. স্থ—৯১
বাইশ. হাইফেন ও ড্যাশচিহ্ন—৯২
তেইশ. সাধু ও চলিত রীতি—৯২
চব্বিশ. 'ই' এবং ' তো'-এর ব্যবহার—৯৩
পঁচিশ—৯৪

বানান
স্বরবর্ণ—৯৭
ব্যঞ্জনবর্ণ—১০৬

গদ্যভাষা : কী করে এলো?—১৩৫
গদ্যের কাজ কী?—১৩৭
বাক্য : রঙ-বেরঙের চেহারা—১৩৯
ভাষার শৈলী নির্মাণ—১৪১
শিক্ষকের গদ্য—১৪২
বন্ধুর গদ্যের নমুনা—১৪৪
প্রিয়জনের গদ্য—১৪৫

সহায়ক গ্রন্থাবলি—১৫১

প্রথম অধ্যায়
ফিরে তাকাই : বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা

এক. [ভাষা]

বর্ণ হল ধ্বনির লিখিত রূপ। চিহ্ন, প্রতীক। প্রত্যেক ভাষার বর্ণগুলো যেন এক-একটি সাজানো ফুল। বাংলায় এদের বলে লিপি, ইংরেজিতে letter, ফারসিতে হরফ, আরবিতে সরফ আর সংস্কৃতে বর্ণ। বর্ণ মানে রঙ, colour। হয়তো প্রাচীনকালে এক-একটি বর্ণকে এক-এক রঙ দিয়ে লিখে সাজিয়ে রাখা হত। লেখা চলত শিলায়, পশুর চামড়ায়-হাড়ে, গাছের ছালে-পাতায়। এখন তোমরা লেখা তৈরি কর ঝকঝকে কাগজে, কম্পিউটার-মোবাইলের রুপালি পর্দায়। তখন তো লেখার সেরকম উপকরণ ছিল না।

পৃথিবীতে রয়েছে কয়েক হাজার ভাষা। এসব ভাষা লেখার পদ্ধতিও ভিন্ন। ধ্বনির রূপ অনুসারে লেখা হয় বাংলা, ইংরেজি আরও অনেক সমৃদ্ধ ভাষা। এসব ভাষার পার্থক্য শুধু বর্ণের চেহারায় নয়, উচ্চারণেও; কলম আর 'কমলে'র পার্থক্য কেবল উচ্চারণে নয়, অর্থেও। শব্দের ভেতরের বর্ণসজ্জার রদবদলে এমনটি হয়েছে। তবে ছবি দিয়েও বর্ণের অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। বলা যায়, চিনা (মান্দারিন) ভাষার কথা। অনেক বর্ণছবিকে মনের পর্দায় ধরে রাখতে হয়। একটি চিনা শিশুকে তা আত্মস্থ করতে হয়। ভেবেছ, কী কঠিন কাজ!

আরবি লেখা হয় সেমেটিক লিপিতে, তেমনি ইংরেজি লেখা হয় রোমান লিপিতে। আর বাংলা লিপি?

ভারতের একটি প্রাচীন লিপির নাম ব্রাহ্মীলিপি। কয়েক হাজার বছর আগে ভারতবাসীরাই সৃষ্টি করে এ লিপি। এর বিবর্তনের ফলেই উদ্ভব হয়েছে বাংলা লিপি। মনে করা হয়, ষষ্ঠ শতকের দিকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে যে লিপি প্রচলিত ছিল, তা ওই লিপির বিবর্তিত রূপ। নাম গুপ্তলিপি (পূর্বদেশীয় রূপ)। এ থেকে এসেছে কুষাণলিপি। আর কুষাণলিপি এসেছে অভিজাত ব্রাহ্মীলিপি থেকে। বাংলালিপি যার উত্তরাধিকার পেয়েছে। এ লিপি বাঙালির কাছে প্রিয়। এতে আছে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আলাদা ভাগ। স্বর সংক্ষেপের জন্য কার-চিহ্ন, স্বল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ বর্ণের আসনবিন্যাস দেখলে অবাক হতে হয়! তোমরা তো জানো, এই বর্ণমালাকে মাতৃমমতায় বাঁচিয়ে রাখতে সংগ্রাম করতে হয়েছে, রক্ত ঝরাতে হয়েছে। উৎসর্গ করতে হয়েছে তাজা জীবন। যার নজির ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

দুই. [বর্ণ]

মানুষের মুখের উচ্চারণের প্রতীকই বর্ণ। সব ভাষায় সব ধ্বনি নেই। যে ভাষার মানুষ, যে ধ্বনি ব্যবহার করে না, সে ভাষায় সে ধ্বনির জন্য বর্ণ নেই; যা জীবন্ত ভাষার স্বভাব। আরবিতে 'ঢ' এর উচ্চারণ নেই। তাই 'ঢ' বর্ণও নেই। আরবিতে 'ঢাকা' বলতে 'ঢ'-কাছাকাছি ধ্বনি (দাল) প্রয়োগ করে বলতে হয় 'দাকা'। ইংরেজিতেও 'ঢ' নেই'। d-এর সাথে h যোগ করে 'dhaka' বলতে ও লিখতে হয়। আবার আরবির 'و' ধ্বনি বাংলায় নেই। তাই কাছাকাছি 'ব'-ধ্বনি দিয়েই কাজ সারতে হয়। وَتِرْ-নামাজ বলতে আমরা 'বিতর নামাজ' বলে থাকি। এছাড়া আর উপায় কী!

স্বর ও ব্যঞ্জন মিলে বাংলা বর্ণের সংখ্যা ৫০। ১১টি স্বরবর্ণ এবং ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ। তবে আদিতে এই সংখ্যা ছিল না। আসলে সংস্কৃত বর্ণমালার আদলে বাংলা বর্ণমালা তৈরি হয়। এতে সমস্যা বাড়ে। কেননা, সব সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণ বাংলায় নেই। থাকার কথাও নয়। বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক অনেক দূরের। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (যার লিখিত ও পরিশুদ্ধ রূপ সংস্কৃত) মানুষের মুখে মুখে রূপান্তরিত হয়ে বঙ্গীয় অঞ্চলে

জন্ম নেয় মধুর-কোমল-বিদ্রোহী প্রাকৃত। তাকে কেউ বলেন, মাগধী প্রাকৃত; আবার কেউ বলেন, গৌড়ীয় প্রাকৃত। এ থেকে হয়েছে বাংলা, সে এক দুষ্ট মেয়ে! কেননা, সে মাতামহী (সংস্কৃত) ও জননীর (প্রাকৃত) কথা শোনেনি। নিজের ইচ্ছেমতো রূপের বদল করেছে বারবার।

প্রায় হাজার বছর আগে প্রাকৃতের কোল থেকে জন্ম হয়েছে বাংলাভাষার। তাই প্রাচীন বাংলার সাথে আধুনিক বাংলার বানানে বেশ পার্থক্য ধরা পড়ে।

- যেমন আজকের বাংলা ই, ঈ এবং উ, ঊ-এর মধ্যে উচ্চারণে পার্থক্য নেই। তখনও পার্থক্য ছিল না।

- ন-ণ, জ-য, স-শ-ষ'র মধ্যে পার্থক্য ছিল না। বানানও হয়েছে ইচ্ছেমতো। যেমন : বাঁশি-বাঁশী, জোই-জোঈ, সবরী-শবরী, পানি-পাণী, সুন-শূণ, সহজে-ষহজে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় (সংস্কৃতে) য-এর উচ্চারণ অনেকটা য়-এর মতো। বাংলায় সেই পুরানো য-এর উচ্চারণ কোথাও জ, আবার কোথাও য় হয়েছে। তাই বাংলা বর্ণমালায় নুতন একটি বর্ণ 'য়' তৈরি করতে হয়েছে।

১৮০১-এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হলেও সংস্কৃত বর্ণের সাথে বাংলা বর্ণের উচ্চারণের তারতম্য চোখে পড়ে রাজা রামমোহন রায়ের। তিনি তাঁর *গৌড়ীয় ব্যাকরণে* (১৮৩৩) ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা দেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের নতুন তালিকা প্রকাশ করেন তাঁর *বর্ণপরিচয়ে* (১৮৫৫)। তিনি স্বরবর্ণের ভাগ থেকে দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯ বাদ দেন; অনুস্বর (ং) ও বিসর্গ (ঃ) স্থান পায় ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায়। নতুন বর্ণ হয়ে আসে ড়, ঢ, য়। যুক্তবর্ণ বলে বাদ গেছে ক্ষ, (ক+ষ)। তবে ক্ষ কি কেবল যুক্তবর্ণ হয়ে বসে? অবশ্যই নয়। সে একক ধ্বনি হয়েও তো শব্দে বসে। ক্ষমা, ক্ষুধা, ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, ক্ষীর, ক্ষয়, ক্ষমতা, ক্ষণিক, ক্ষরণ—এসব শব্দে একক ধ্বনি খ-ই উচ্চারিত হচ্ছে। তাই না?

তিন. [বাঙলা লিপি]

বাংলালিপি কী করে ছাপার কারাগারে আটকে গেল, সে গল্পটা বেশ মজার। আচ্ছা, বলি।

সব সমৃদ্ধ ভাষায় লিপির রদবদল হয়েছে বারবার। শুধু লিপি কেন, লেখার কোনো কোনো বিষয় এক পুঁথি থেকে লিপিকারের হাত ঘুরে অন্য নতুন পুঁথিতে গেলেই তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংক্ষেপণের চিহ্ন ফুটে ওঠে। তবে এর ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই, তা নয়। কুরআনের কথাই বলা যায়। অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি বর্ণেরও পরিবর্তন হয়নি! হাতে হাতে কপি করেছেন লিপিকাররা—সারা মুসলিম জাহানে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পঠন-পাঠন চলেছে; তবে একটি হরকত পাল্টায়নি! ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, তাসখন্দে, ইস্তাম্বুলের তোপকাপি মিউজিয়াম ও মক্কা মিউজিয়ামে রক্ষিত পুরানো কপি আর নিজের ঘরের কপিটি পরখ করলে তা বোঝা যায়। কোথাও একটি বর্ণের পরিবর্তন হয়নি। মূলে যা ছিল তা-ই। যা দুর্লভ, ব্যতিক্রম[১]...

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা বর্ণমালা বিবর্তিত হয়েছে বারবার। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির হাতের ছোঁয়ায় বাংলা লিপির আকৃতি বদলেছে। তবে মুদ্রাযন্ত্রের সোহাগমাখা শাসনে বর্ণের রূপ স্থির হয়ে যায়। শোভন ও সুশ্রী হয় বাংলা লিপিমালা। পদ্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগের একমাত্র সাহিত্য পদবাচ্য। বাংলা গদ্য আধুনিক কালের সৃষ্টি।

চর্যাপদ প্রাচীন যুগের সাহিত্যনিদর্শন। বৌদ্ধ-সহজিয়া কবিদের এ লেখা কবিতা এদেশ থেকে এক সময় হারিয়ে যায়। পাওয়া যায় নেপালের

---

১. কুরআন এক ও অপরিবর্তনীয়। যারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, তাসখন্দ অথবা ইস্তাম্বলের তোপকাপি যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন শিলাগুলির সঙ্গে নিজ ঘরে রক্ষিত যে-কোনো একটি কুরআনের কপি মিলিয়ে দেখুন, একই কপি! ১৪০০ বছর চলে গেছে, কোথাও একটি জের-জবরের পরিবর্তন নেই। বিজ্ঞানের এত উন্নতর অবকাশ সেদিন ছিল না। মানুষের স্মৃতিতে, হাতে লিখে এই কুরআন সংরক্ষিত হয়েছিল সেদিন। আর আজ তা পরিবর্তনের তো প্রশ্নই ওঠে না। এর সঙ্গে মিলিয়ে কুরআনের অমোঘ সম্ভাষণ পড়ুন—'আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহা সফল্য।' ১০/১৪, মোস্তফা জামান আব্বাসী, *ক'ফোঁটা চোখের জল*, পৃ. ৯৮।

রাজগ্রন্থাগারে। ১৯০৭ সালে। আর মধ্যযুগের প্রথম কাহিনিকাব্যের পুঁথি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* উদ্ধার করা হল বাঁকুড়া জেলার এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে, ১৯০৯-এ। দুটোই ছাপা হল ১৯১৬-তে। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়।

চার. [আবিষ্কার ও বিকাশ]

এবার একটু পেছনে ফেরা যাক। কয়েকটি ছাপানো বাংলা লিপির নমুনা পাওয়া গেল চায়না *ইলাস্ট্রেতাত* নামের পুস্তকে, যা ছাপা হয় আমাস্টারডাম থেকে ১৬৬৭ সালে। এরপর ১৭৪৩ সাল...

তখনও বাংলা বর্ণের কোনো মানরূপ স্থির হয়নি। তাই বাঙালি জাতিও প্রয়োজনবোধ করেনি কোনো অভিধানের, এমন কি ব্যাকরণেরও। এ সময় এক বিদেশি ধর্মযাজক, মানোএল দা আসসুম্পাসাঁউ, পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে বের করেন তিনটি বই : ১. *ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ* ২. *কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ* ৩. *ভোকাবুলারি ও এম ইদিওসা বেনগল্লা ই পর্তুগিজ*; যা ছিল রোমান হরফে লেখা। তিনি যিশুর ধর্ম প্রচার করতে আসেন ভাওয়াল এলাকায়। প্রয়োজন অনুভব করেন দেশীয় ভাষা বাংলার শব্দকোষ ও বাক্যবন্ধনের নমুনা। তাঁর এই রচনাবলিতে ছিল একটি অভিধান এবং এতে জুড়ে দেন একটি ছোট্ট ব্যাকরণ। ভাওয়ালের গরিব-নিরক্ষর মানুষের কাছে গিয়ে তিনি সংগ্রহ করেন দৈনন্দিন জীবনের শব্দ। যা দিয়ে তৈরি করেন অভিধান, সেইসঙ্গে ব্যাকরণ—হোক না তা রোমান হরফে লেখা। তবু তা তো বাংলাভাষার সম্পদ। হয়তো পর্তুগালে এই পাদরির নাম আজ নেই, মুছে গেছে; কিন্তু প্রথম অভিধান ও ব্যাকরণরচয়িতা হিসেবে তাঁর নাম বাংলাভাষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এলো ১৭৭৮ সাল। বাংলাভাষার ইতিহাসে আরেকটি স্মরণীয় বছর। হুগলি থেকে বেরুল একটি ব্যাকরণ বই : *A grammer of the Bengal languags*। রচয়িতা—ন্যাথিনিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড। বইটি ইংরেজিতে লেখা। তবে এর বাংলা উদাহরণগুলো ছাপা হয় বাংলা বর্ণে। ওই উদাহরণ ছাপাতে গিয়ে বাংলা বর্ণ তৈরি করতে হয়। ছেনির আঘাতে

ধাতুর অক্ষর সুস্থির হয়। স্থায়ী হয় অনন্তকালের জন্য। অক্ষর বানান চার্লস উইলকিনস। তাকে সাহায্য করেন পঞ্চানন ও মনোহর কর্মকার। তাদের তৈরি বাংলা বর্ণগুলো ছিল সুশ্রী ও চমৎকার। এরপর মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনে দেখা গেল মনো ও লাইনো অক্ষর। রূপসী বাংলা বর্ণমালা।

এখন তো তোমরা কম্পিউটারের ঝলমলে হরফ দেখে আনন্দিত হও। ভেবে দেখেছ কি, শুরুতে কীভাবে কাদের হাতের ছোঁয়ায় বর্ণমালা ধাতুর শৃঙ্খলে বন্দি হল, সুস্থির ও শোভন হয়ে উঠল!

পাঁচ. স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা

স্বরবর্ণ :

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ—**১১টি**

ব্যঞ্জনবর্ণ :

ক খ গ ঘ ঙ　　চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ　　ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম　　য র ল শ ষ স
হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ —৩৯টি

তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ, ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় ব একটি। প-বর্গের ব-টি রয়ে গেছে। তবে অন্তঃস্থ-ব নেই। এই বর্ণটি কিছুটা উচ্চারিত হয় ইংরেজি W কিংবা আরবি و-এর মতো। এর সরাসরি উচ্চারণ নেই। শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে ফলা হিসেবে বসে, যুক্তভাবে। শব্দের আদিতে উচ্চারণ নেই। তবে মধ্যে ও শেষে বসলে দ্বিত্ব (দু-বার উচ্চারিত) হয়; অর্থাৎ যে বর্ণের সাথে বসে, তাকে দু-বার উচ্চারণ করায়। আরবিতে বলা যায় তাশদিদ (أَبَّ)।

শব্দের আদিতে : স্বভাব (শভাব), স্বাদ (শাদ) স্বাধীন (শাধিন)।

শব্দের মধ্যে : শাশ্বত (শাশ্‌শতো), সাত্ত্বিক (শাত্‌তিক), বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ), বিদ্বান (বিদদান)

শব্দের অন্তে : বিশ্ব (বিশ্‌শো), নিঃস্ব (নিশ্‌শো), গুরুত্ব (গুরুত্‌তো)।

বাংলা বর্ণমালার ৫০টি বর্ণের ৩২টি পূর্ণ মাত্রার (অ আ ই ঈ উ ঊ ক ঘ চ ছ জ ঘ ট ঠ ড ঢ ত দ ন ফ ব ভ ম য র ল ষ স হ ড় ঢ় য়), ৭টি অর্ধমাত্রার (ঋ খ গ ন থ ধ প শ) এবং ১০টি মাত্রাহীন (এ ঐ ও ঔ ঙঞ ৎ ং ঃ) বর্ণ।

ছয়. কার ও ফলা

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হল কার। কোনো কোনো সময় স্বরবর্ণ পূর্ণরূপে না বসে সংক্ষিপ্তরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে জড়িয়ে বসে। যেমন : কাবা (ক+আ, ব+আ)। ক এবং ব-এ আ স্বরধ্বনি সংক্ষেপে জড়িয়ে বসেছে। তোমরা পড়তে বসে বলো—স-এ আকারে 'সা', ব-এ আকারে বা।

আরবিতে যাকে বলে হরকত (এক যবর, এক যের, এক পেশ) ও তানবিন (দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ)। বাংলায় স্বরচিহ্নও বলা যেতে পারে।

যেমন, আ-কার, (া), ই-কার (ি), ঈ-কার ী), উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ), ঋ-কার (ৃ), এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ), ও-কার(ো), ঔ-কার (ৌ)। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হল : একটি স্বরবর্ণের উচ্চারণ আছে, কার-চিহ্নও আছে; কিন্তু বর্ণমালায় তার জায়গা নেই! বর্ণটি 'অ্যা'। এর কার-চিহ্নটিও সবার পরিচিত (্যা/্য)। আবার 'অ'-এর উচ্চারণ ও পূর্ণরূপ আছে, কিন্তু কার-চিহ্ন নেই। সব স্বাধীন ব্যঞ্জনের সাথে উচ্চারিত হয়। শব্দের ভেতরের কোনো স্বরবর্ণ হস-চিহ্ন ছাড়া লিখিত হলে তাতে অ-কার আছে বলে আমরা মনে করি। যেমন : ফল—ফ-এর সাথে একটি অদৃশ্য অ উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু ল-এর সাথে অ নেই। 'ল' স্বরবর্ণহীন। এজন্য অ-কারের অনুপস্থিতি বুঝানোর জন্য হস-চিহ্নের প্রয়োগ জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন : ফুস্ফুস, শাহ্। বেশিরভাগ শব্দের হস-চিহ্ন দেওয়া থাকে না। বুঝে নিতে হয় : কাঁকন, ফুলের, আশিক, বাতাস, মানব। তবে এসব শব্দের উচ্চারণ লেখার সময় তোমাকে অবশ্যই হস-চিহ্ন দিতে হবে।

কার-চিহ্ন কোনো ব্যঞ্জনের ডানে-বামে আবার কোনো ব্যঞ্জনে উপরে-নিচে ও দু দিকে বসে।

ডানে : আ-কার (বাবা), ঈ-কার (শ্রমজীবী), অ্যা-কার (ব্যাকুল), (ব্যয়)
বামে : ই-কার (বিধি), এ-কার (দেরি), ঐ-কার (সৈকত)
নিচে : উ-কার (তরুণ), ঊ-কার (ভূমিকা), ঋ-কার (সৃষ্টি)
দু-দিকে : ও-কার (শোভন), (গোসল), (রোজা)
দু-দিকে ওপরে : ঔ-কার (সৌরভ), (গৌণ), (মৌন)।

উ-কার/ঊ-কারের কয়েকটি রূপ :

	উ	ঊ	ঋ
গ	গু		
র	রু	রূ	
হ	হু		হৃ
শ	শু		

এসব পুরানো রূপ বাদ দেওয়া হয়েছে। তোমরা নতুন রূপ ব্যবহার করতে পারো (গু, শু, রু, রূ, হু)।

কার-চিহ্নের মতো ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলা হয়। কখনও কখনও ফলায় ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ বদলিয়ে যেতে পারে। তখন তোমাদের চিনতে অসুবিধা হয়। যেমন :

স্মরণ—(স-এ ম-ফলা ব্যবহার করা হয়েছে)
ব্যবস্থা—(স-এ থ। যদিও দেখতে হ-এর মতো)
তীক্ষ্ণ—(ক্ষ-তে ণ। যদিও দেখতে ন-এর মতো)
সূক্ষ্ম—(ক্ষ-তে ম। যদিও দেখতে ণ-এর মতো)।

এভাবেই যে বর্ণটি কোনো ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়, তার নাম অনুসারেই ফলার নাম হয়। যেমন—ম-ফলা : শব্দের প্রথমে থাকলে উচ্চারিত হয় না। কেবল আনুনাসিক হয়। শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকলে দু-বার (দ্বিত্ব) উচ্চারণ করা হয়। উদাহরণ দেখে নাও :

শব্দের প্রথমে : স্মরণ (শঁরোন), শ্মশান (শঁশান)
শব্দের মধ্যে ও শেষে : বিস্ময় (বিশশঁয়), অকস্মাৎ (অকোশ্শাঁত)